#আমি পদ্মজা পর্ব ৭৪

_____
কারো জন্য কারো জীবন থেমে থাকে না। সময় তার মতো করে সবাইকে নিয়ে ছুটে বেড়ায়। দেখতে দেখতে কেটে গেছে দুইদিন। মজিদ আলগ ঘরের বারান্দায় বসে আছেন। দুপুর অবধি বাড়িভর্তি মানুষ ছিল। মোড়ল বাড়ির সবাই ছিল। কিছুক্ষণ হলো সবাই নিজেদের বাড়ি ফিরেছে। তিনি মনে মনে ক্রুদ্ধ। আমিরের শক্ত হাতের চাপ তার গায়েও পড়েছে, তা মানতে পারছেন না। বিপদের আশঙ্কায় মাথা দপদপ করছে।
বাড়িতে আসা অনেকে প্রশ্ন করেছে,মুখে কী হয়েছে? মজিদ তখন লজ্জা নিয়ে জবাব দিয়েছে, সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়েছিল। এছাড়া যুক্তিগত আর কোনো অজুহাত তিনি খুঁজে পাননি। অনেকে মজিদকে সন্দিহান চোখে

দেখেছে। মজিদ চেয়ার এক হাতে খামচে ধরেন। রাগে শরীর পুড়ে যাচ্ছে। বুকের ভেতর দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। সেখানে খলিল উপস্থিত হয়। মজিদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য খ্যাঁক করে কাশেন। মজিদ তাকালেন না। খলিল বললেন,'ভাই,সমাবেশের কী করন?'
'রবিবারের দাওয়াত দিবি। ফরিনার জন্য দোয়া চেয়ে নেব সবার কাছে। এখন ভালো সময়।'
'আইচ্ছা। ভাই?'
মজিদ তাকালেন। খলিল বললেন,'ছেড়িগুলারে কবে পাডাইবা?'
'আরো তো ছয়টা মেয়ে বাকি। কবে পাঠাবে,আমির জানে। ওর সাথে কথা বল।'
'তোমার ছেড়ার লগে আমি কথা কইতে পারতাম না।' খলিল ঘোর আপত্তি জানালো। মজিদ আড়চোখে খলিলকে দেখলেন। দৃষ্টিতে অনেক রাগ। কিছুক্ষণ পর প্রশ্ন

করলেন,’রিদওয়ান কোথায়?’
‘বাজারে।’
‘আচ্ছা,যা। ‘
খলিল জায়গা ত্যাগ করেন। মজিদ এক হাতে কপাল ঠেকিয়ে ভাবেন,আমিরের মনে কী চলছে? কেন তার চোখের দৃষ্টি দুইরকম! এভাবে চলতে থাকলে, হাওলাদার বংশে দূর্যোগ নেমে আসবে।

_____
বাইরে মোলায়েম ঠান্ডা বাতাস। পড়ন্ত বিকেলের স্নিগ্ধ পরিবেশ। পদ্মজা শাল দিয়ে মাথা ঢেকে রেখেছে। সে ধীর পায়ে হেঁটে আসছে। পিছনে দুজন লোক। ফরিনার ঘরের সামনে এসে থমকে যায় পদ্মজা। পালঙ্কে পিঠ ঠেকিয়ে মেঝেতে বসে আছে আমির। এক হাঁটুতে এক হাত রাখা। জানালা দিয়ে আসা বাতাসে তার কপালে ছড়িয়ে থাকা চুলগুলো নড়ছে। কারো উপস্থিতি টের পেয়ে আমির

চোখ তুলে তাকাল। পদ্মজা ঘরে প্রবেশ করে। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো,'অথচ আপনি আমার মাকে খুন করতে চেয়েছিলেন। অন্যের মা তো! তাই না?'
আমির চোখ সরিয়ে নিলো। পদ্মজা বললো,'যে মেয়েগুলোকে শিকার করেন, সে মেয়েগুলোর মায়েদের এরকমই কষ্ট হয়! আমি অবাক হচ্ছি, আপনি আম্মার জন্য কষ্ট পাচ্ছেন দেখে!'
'কথা শোনাতে এসেছো?'
পদ্মজা হাসলো। বললো,'যখন আম্মা দিনের পর দিন কষ্ট সহ্য করে যাচ্ছিলো, তখন কোথায় ছিলেন? কেন তাকে শান্তির দেখা দেননি? ছেলে হিসেবে কী করেছেন? উল্টো কষ্ট দিয়েছেন।'
'আম্মা আমার সম্পর্কে কিছু জানতোই না। কষ্ট পাবে কেন? '

‘তিনি কখন জেনেছেন সব?’
আমির নিরুত্তর। পদ্মজা উৎসুক হয়ে রইলো।
আমির বেশ খানিকক্ষণ পর বললো,’যেদিন বাড়িতে এসেছি। সেদিন রাতে।’
পদ্মজার কপালে ভাঁজ পড়ে। সে প্রশ্ন করলো,’যেদিন আম্মা আমাদের ওই বাড়ি থেকে আনতে গিয়েছিল, সেদিন?’
‘হুম।’ আমির জবাব দিল ছোট করে।
‘কীভাবে জেনেছে?’
আমির বিরক্তি নিয়ে পদ্মজার দিকে তাকালো। বললো,’এত প্রশ্ন করো কেন?’
‘আমি জানতে চাই।’
‘জেনে কী হবে? আম্মা আমাকে থাপ্পড় তো কম দেয়নি! আমি চুপ করে সহ্য করেছি। আম্মাকে কিছু বলিনি। তাহলে আমি কী করে কষ্ট দিয়েছি?’
আমিরের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে পদ্মজা প্রশ্ন

করলো,’আপনি এই পাপের সাথে জড়িত সেটা আম্মা এতদিনেও বুঝেনি কেন? কীভাবে লুকিয়ে রেখেছেন?’
আমির চট করে উঠে দাঁড়ায়। মনের সবটুকু রাগ পালঙ্কে লাথি মেরে মিটিয়ে নেয়। তারপর বেরিয়ে যায়। পদ্মজারও রাগ হয় খুব। সে নিজের ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর আলমারি খুলে ছুরি নিলো। আমির ঘর থেকে সব ছুরি সরিয়ে দিয়েছিল। মানুষের ভীড়ে পদ্মজা মজিদের ঘর থেকে দুটো ছুরি সংগ্রহ করেছে। সতর্কতার সাথে একটা ছুরি শরীরের ভাঁজে রেখে দিলো পদ্মজা।
আলমারির কপাট লাগাতে গেলেই একটা চিঠি মেঝেতে পড়ে। পদ্মজা দ্রুত চিঠিটি তুললো। পূর্ণা সকালে দিয়েছে। আলমগীর পদ্মজার নামে মোড়ল বাড়িতে এই চিঠি পাঠিয়েছে। চিঠির খামের উপর লেখা, “পদ্মজা ছাড়া অন্য কারো চিঠি পড়া নিষেধ।”

তাই পূর্ণা অথবা প্রেমা কেউ পড়েনি। পূর্ণার মনে হয়েছিল এটা গোপনীয় চিঠি। তাই সে লুকিয়ে পদ্মজাকে দিয়েছে। পদ্মজা এখনো পড়েনি। সে যত্ন করে রেখে দেয়। সময় বুঝে পড়বে।

আমির তৃতীয় তলার একটা ঘরে এসে বসলো। তার নিজেকে পাগল পাগল লাগছে। এক হাত কাঁপছে। যখন সে নিজের সত্তার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে তার পা অথবা হাত কাঁপে। আমির জানালার বাইরে মিনিট দুয়েক তাকিয়ে থাকে। তারপর আচমকা দেয়ালে নিজের কপাল দিয়ে আঘাত করে। তিন বারের সময় কপাল ফেটে রক্ত বেরিয়ে আসে।
চোখ দুটি ছোট ছোট হয়ে যায়। তার ঠোঁট শুকিয়ে কাঠ। শরীর অসাড় হয়ে পড়ে। তবুও জ্ঞান হারায়নি। দূর্বল হয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় শুয়ে থাকে মেঝেতে।

_____

মৃদুল মোড়ল বাড়ির পথে দাঁড়িয়ে আছে। তার আজ বাড়ি ফেরার কথা ছিল। অনেকদিন ধরে অলন্দপুরে সে মেহমান হয়ে আছে। ছোটবেলা একবার চার মাস হাওলাদার বাড়িতে ছিল। তারপর আর থাকা হয়নি। এইবার এক মাস হয়ে যাচ্ছে। এতদিন থাকতো না,যদি না পূর্ণার দেখা পেতো। জ্যোৎস্না রাত নিয়ে অনেক জল্পনাকল্পনা ছিল। কিন্তু ফরিনার মৃত্যুর জন্য সে রাত উপভোগ করা হয়নি। সে আগামীকাল বাড়ি ফিরবে। তাই পূর্ণার সাথে দেখা করতে এসেছে।

নূপুরধ্বনি ভেসে আসে! মানে পূর্ণা আসছে! মৃদুল সোজা হয়ে দাঁড়ালো। পূর্ণা দৃশ্যমান হয়। সে মৃদুলের সামনে এসে দাঁড়াল। মৃদুল পূর্ণার দিকে এক কদম এগিয়ে এসে বললো,'কেমন আছো?'

‘ভালো। আপনি কেমন আছেন?’
‘ভালা। প্রান্তর কী খবর?’
‘কুড়াল বানাচ্ছে।’
‘ওর কামই এমন।’
পূর্ণা হাসলো। মৃদুল বললো,’চলো নদীর দিকে হাঁটি।’
‘চলুন।’
দুজন মাদিনী নদীর পাশে এসে দাঁড়ায়। দুই দিকে গাছপালা। দুজনের মাঝে দুই হাত দূরত্ব। মৃদুল এক টুকরো পাথর নদীর পানিতে ছুঁড়ে দিল। পাথরটি পানিতে দুই,তিন বার ব্যাঙের মতো লাফ দিয়ে ডুবে যায়। পূর্ণা হাসলো। বললো,’আমিও এরকম পারি।’
মৃদুল একটা পাথর পূর্ণার হাতে দিয়ে বললো,’কইরা দেখাও।’
পূর্ণা করে দেখালো। তারপর বললো,’চাপা মারি না আমি।’

মৃদুল শুধু হাসলো। কিছু বললো না। পূর্ণা অপেক্ষা করছে,মৃদুল কী বলবে শোনার জন্য। অনেকটা সময় কেটে যায়। মৃদুল পূর্ণার দিকে ঘুরে দাঁড়ায়। দুই পা এগিয়ে আসে। পূর্ণা চাতক পাখির মতো তাকিয়ে রয়েছে। মৃদুল পূর্ণার দুই হাত শক্ত করে ধরলো। পূর্ণা আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে। মৃদুল তার হাত ধরলে সে অন্য এক জগতে চলে যায়। যে জগতে কেউ নেই। শুধু ভালোবাসা,ভালোবাসা আর ভালোবাসা। মৃদুল বললো,"রাইতে বাড়িত যাইতাছি।'
বাড়িতে যাবে শুনে পূর্ণার চোখেমুখে আঁধার নেমে আসে। সে প্রশ্ন করলো,'রাতে কেন?'
'রাতে হাওলাদার বাড়ির একটা ট্রলার ওদিকে যাইব। তাই রাইতেই যাব ভাবতাছি।'
পূর্ণা নতজানু হয়ে ব্যথিত স্বরে
বললো,'ওহ,আচ্ছা যান।'
মৃদুল বললো,'মন খারাপ কইরো না। জলদি আইসা পড়ব।'

পূর্ণার কান্না পাচ্ছে। মৃদুল চলে যাবে শুনলেই,তার বুক ফেটে কান্না আসে। সে মৃদুলের চোখের দিকে তাকিয়ে বললো,'কেন আপনি এতো দূরের মানুষ?'
তার ব্যাকুল কণ্ঠের অভিযোগটি মৃদুলের হৃদয়কে কাঁপিয়ে তুলে। সে মৃদু হাসলো। পূর্ণার হাত দুটি শক্ত করে ধরে বললো,'আম্মা-আব্বারে নিয়া আসব।'
পূর্ণা চকিতে তাকায়। ঠোঁট দুটি নিজেদের শক্তি আলাদা হয়ে যায়। মৃদুল পূর্ণাকে আরো অবাক করে দিতে বললো,'তোমার আপাই বলেছে,আমার আম্মা-আব্বাকে নিয়া আসতে।'
পূর্ণার হৃৎপিণ্ড থমকে যায়। চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসে। সে বসে পড়লো। দুই হাতে মুখ ঢেকে লম্বা করে নিঃশ্বাস নিয়ে বললো,'কী বলছেন এসব!'
মৃদুল পূর্ণার সামনে বসলো। পূর্ণাকে নিজেকে সামলে নিতে দিল। তারপর বললো,'যা হওয়ার

ছিল,তাই হইতাছে।’
পূর্ণা ঠোঁটে হাসি,চোখে জল নিয়ে মৃদুলের দিকে তাকালো। তার ইচ্ছে হচ্ছে মৃদুলকে জড়িয়ে ধরতে। কিন্তু এটা অসম্ভব। সে চোখ বুজতেই দুই ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে। ভালোবাসার কথা বলা হয়নি,তবুও দুজন মনে মনে জানে তারা একজন, আরেকজনকে কতোটা ভালোবাসে। কতোটা চায়!
মৃদুল বললো,’সন্ধ্যা হইয়া যাইতাছে। এখন বাড়িত যাও। আমি সন্ধ্যার পরে খাওয়াদাওয়া কইরা রওনা দেব।’
পূর্ণা কী বলবে খুঁজে পাচ্ছে না। এটা সে কী শুনলো! সে ধীর কণ্ঠে বললো,”সাবধানে যাবেন,সাবধানে আসবেন।’

মৃদুল পূর্ণার চোখে চোখ রেখে মাথা নাড়ালো। সন্ধ্যার পূর্ব মুহূর্তের আলোয় পূর্ণাকে তার অপ্সরী মনে হচ্ছে। চোখের ঘন পাঁপড়িগুলো

চোখের জলে ভিজে আরো ঘন,কালো হয়ে উঠেছে। পূর্ণা মৃদুলের তাকানো দেখে লজ্জা পেল। বললো,'কালো মানুষকে এভাবে দেখার কী আছে?'
মৃদুল চমৎকার করে বললো,'তুমি যদি আমার চোখ দিয়া নিজেরে দেখতা বুঝতে পারতা তুমি ঠিক কতোটা সুন্দর!'
কথাটি পূর্ণার হৃদয় নাড়িয়ে দেয়।

_____

শুটিং চলছে আসহাব নামে একজন ব্যারিস্টারের বাড়ির পুকুরঘাটে। আসহাব চৌধুরী পরিচালক আনোয়ারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আসহাব ঢাকায় থাকেন। কয়দিন হলো গ্রামে এসেছেন। বাড়িটা বানিয়েছেন বাংলো বাড়ির মতো। আসহাব ও আনোয়ার ছাদে বসে গল্প করছেন। শুটিং শেষ হয় সন্ধ্যার খানিক পর। লিখন ক্লান্ত। সে জ্যাকেট পরে বারান্দায় এসে বসে। চারিদিকে গাছপালা। সুন্দর দৃশ্য। তার

সহযোগী চা দিয়ে যায়। সে চায়ে চুমুক দিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে ভাবে,পদ্মজার কথা।
সোমবারে তাদের দল ঢাকা ফিরবে। তার আগে দেখা হতো যদি! তৃধা লিখনের পাশে এসে বসলো। লিখন তৃধাকে খেয়াল করে বললো,'তৃধা!'
তৃধা তার মিষ্টি কণ্ঠে বললো,'অন্য কাউকে আশা করেছিলে?'
লিখন হেসে চায়ে চুমুক দিল। বললো,'আর কার আশা করব?'
'কেন? পদ্মজা।'
লিখন জোরে হেসে উঠলো। যেন তৃধা কোনো মজার কথা বলেছে। লিখন বললো,'তুমি অপ্রয়োজনীয় কথা বেশি বলো তৃধা। পদ্মজা এখানে আসবে কোন দুঃখে?'
'আসতেও পারে।' তৃধার কণ্ঠে হিংসা। সে পদ্মজা নামের না দেখা মেয়েটাকে খুব হিংসা

কিরে। সব মেয়েরা তাকে হিংসা করে,আর সে করে বিবাহিত এক মেয়েকে! যে মেয়ে তার স্বপ্নের পুরুষের বুকের পুরোটা জুড়ে থাকে। যদি সে পারতো,লিখনের বুক ছিঁড়ে পদ্মজার নামটা মুছে দিত।
লিখন নির্বিকার কণ্ঠে বললো,'ঘরে যাও তৃধা।'
'যাব না।'
'এভাবে চলতে থাকলে,আর কখনো তোমার সাথে কাজ করার সুযোগ হলেও করতে পারব না।'
তৃধার মুখটা লাল হয়ে যায়। রাগে,হিংসায় চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসে। সে কান্নামিশ্রিত কণ্ঠে বললো,'আমিতো বলেছি,আমি তোমার বাসার কাজের মেয়ে হতেও রাজি।'

লিখনের মুখ ফসকে চা বেরিয়ে আসে। সে হাসতে থাকে। তৃধা প্রায় সময় এমন অদ্ভুত, অদ্ভুত কথা বলে। যা একটা সদ্য কিশোরী

মেয়েকেই মানায়। তখন পরিচালক আনোয়ার হোসেন সেখানে উপস্থিত হয়। লিখনকে ওভাবে হাসতে দেখে প্রশ্ন করলেন,' কী নিয়ে এতো হাসা হচ্ছে?'
তৃধা দ্রুত চোখের জল মুছলো। লিখন হাসি থামিয়ে বললো,'তেমন কিছু না। বসুন।'
'না,বসব না। শুনো লিখন,হাওলাদার বাড়ির মাতব্বরকে তো চিনো?'
'জি। দুইদিন আগে বাড়ির কর্তী মারা যায়। দেখতে গিয়েছিলাম।'
'হুম,শুনেছি। মাতব্বর মজিদ হাওলাদার প্রতি বছর বাড়ির ছেলে-বউদের নিয়ে শীতে গরীবদের শীতবস্ত্র দান করেন। বড় সমাবেশ হয়। বড় উদার মনের মানুষ। সমাবেশ শেষে কয়েকজনকে নিয়ে ভোজন আসর জমান। মজিদ হাওলাদারের ভাই আসহাবের সাথে আমাকে দাওয়াত করে গেছেন। আমি আগামীকাল সেখানে থাকব। এদিকটা

তোমাদের রেখে যাচ্ছি।’
লিখন আনোয়ারকে আশ্বাস দিয়ে বললো,’চিন্তা করবেন না। এখানে সবাই বুঝদার। কেউ বিশৃঙ্খলা করবে না।’
‘সে আমি জানি। দাওয়াত পেয়ে আমি খুব আনন্দিত। মজিদ হাওলাদারের অনেক সুনাম শুনেছি। এবার স্বচক্ষে দেখতে পারবো। খুব ভালো লাগছে।’
‘জি,তিনি খুব ভালো মনের মানুষ। আমি একবার ছিলাম উনার বাড়িতে। পরিবারের সবাই খুব ভালো।’
আনোয়ার হোসেন হাওলাদার বাড়ি সম্পর্কিত আরো কিছু কথা বললেন। তারপর চলে যান। তৃধা লিখনকে প্রশ্ন করলো,’তাহলে পদ্মজাও আসবে?’
‘হু,আসবে বোধহয়।’
তৃধার মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে যায়। পদ্মজা নাম উঠলেই তার খারাপ লাগে। তবুও সে এই নাম

তোলে। সে অভিমানী স্বরে বললো,’তুমি যাবে?’
‘ভাবছি যাব।’
‘আমিও যাব। সেই ভাগ্যবতী মেয়েটাকে দেখতে চাই।’
লিখন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।
বললো,’ভাগ্যবতী মেয়ে না একটা ভাগ্যবান পুরুষকে দেখাব।’
কথা শেষ করে লিখন সামনের দিকে পা বাড়ায়। তৃধা তখন বললো,’ সে নিশ্চয়, আমির হাওলাদার। আপনার শুধু এই একটা মানুষকেই কেন ভাগ্যবান মনে হয়?’ শেষটুকু রাগে কিড়মিড় করে বললো, তৃধা।
লিখন এগিয়ে যেতে যেতেই বললো,’তুমি এতসব কোথা থেকে যে জানো!’

_____

অন্দরমহলে মজিদ ছাড়া কোনো পুরুষ নেই। তাদের মেয়ে পাচারের সময় ঘনিয়ে এসেছে। সবাই শিকারে অথবা কোনো প্রয়োজনীয়

কাজে গেছে বোধহয়। মৃদুল নিজের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা করেছে। মগা কোথায় পদ্মজা জানে না। মদন মারা গেছে। এই খবর শুনে পদ্মজা অবাক হয়েছিল। মদনের মাথায় আঘাত ছিল,ব্যান্ডেজ ছিল। এই অবস্থায় সেদিন পাতালঘরে যাওয়ার সময় পদ্মজা মদনের মুখ না দেখে মদনকে মাথার একই জায়গায় আঘাত করেছিল। ফলে, অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণে মারা যায়। পদ্মজার দুঃখ হয় আলোর জন্য। আলোর মা নেই,এখন বাবাও নেই। পদ্মজা এই মুহূর্তে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। সে চারপাশ পর্যবেক্ষণ করছে। অন্দরমহলের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে দুজন লোক। যারা পদ্মজাকে পাহারা দেয়। মজিদের উপর হামলা করার উপযুক্ত সময়! পাতালঘরের চাবিও নিতে হবে। পদ্মজা অনুসন্ধানী চোখে চারপাশ দেখতে দেখতে মজিদের ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো।

আমির দুই হাতে মাথা চেপে ধরে উঠে বসে। মাথাটা ভন ভন করছে,রক্ত শুকিয়ে গেছে। সে দেয়ালে হাত রেখে উঠে দাঁড়ায়। তারপর এলোমেলো পায়ে বেরিয়ে আসে। তাকে পাতালঘরে যেতে হবে। সে নিচ তলায় নামার জন্য সিঁড়িতে পা রাখে। মজিদের ঘরের পাশেই সিঁড়ি। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পেতেই পদ্মজা সাবধান হয়ে যায়। সে ছুরি হাতে ওৎ পেতে থাকে। আমিনা কখনো উপরে যায় না। লতিফা,রিনুকে সে নিজে নিচ তলার এক ঘরে ঘুমাতে দেখেছে। যে ব্যাক্তি নেমে আসছে,তার পায়ের শব্দ ধীর গতির। ধীর গতিতে একমাত্র খলিল সিঁড়ি ভেঙে নামে। পদ্মজার অনেক দিনের ইচ্ছে,খলিলকে জখম করার। অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। পায়ের শব্দটি কাছে আসতেই পদ্মজা ছুরি দিয়ে আন্দাজে আঘাত করে। আমির 'আহ' করে উঠলো। আক্রমণকারীরা কখনো আমিরের থাবা থেকে

বের হতে পারে না। আঘাত পাওয়ার সাথে সাথে আমির পদ্মজাকে না দেখেই,পদ্মজা কিছু বুঝে উঠার পূর্বে আন্দাজে তার এক হাত দিয়ে পদ্মজার মুখ খামচে ধরে দেয়ালে বারি মারলো। তাৎক্ষণিক আমিরের নখ ডেবে যায় পদ্মজার দুই গালে! রাতের অন্ধকার একজন আরেকজনকে ভুলক্রমে আঘাত করার মাধ্যমে ইশারা দেয়,তারা দুজন দুই পথের পথিক!

চলবে...